একজীবনে আনিসুজ্জামান

পিয়াস মজিদ

করোনার কারণে যখন আমরা এক নিদারুণ দুষ্কাল পার করছিলাম তখনও সবাই বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন থেকেছি একজন মানুষের জন্য। মানুষটি তাঁর নামের জোরেই যেন অনায়াসে আদায় করে নিতেন সকলের শ্রদ্ধা, সম্মান আর ভালোবাসা। মানুষটির নাম আনিসুজ্জামান। 'আবু তৈয়ব মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান'— এই পারিবারিক নামে আজ তাঁর পরিবারের অনেকেই তাঁকে চেনেন কিনা সন্দেহ, 'আনিসুজ্জামান' এমন প্রায় দ্বিতীয়রহিত হ্রস্ব নামে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন উভয় বাংলার সাধারণ মানুষ থেকে বিশ্ব-বিদ্যায়তনিক পরিসরে। ১৯৩৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জন্মস্থান কলকাতা থেকে ১৪ মে ২০২০ প্রয়াণস্থান ঢাকা। তিরাশি বছর তিন মাসের এক অনন্য জীবন। মাঝখানে ব্রিটিশ ভারত, পরাধীন পাকিস্তান আর স্বাধীন বাংলাদেশ। আনিসুজ্জামানের জীবন আসলে প্রায় এক শতাব্দীর ভাঙাগড়া আর লড়াই-রক্তিম বাঙালির ইতিবৃত্ত। পার্ক সার্কাস হাইস্কুলের ছাত্র, 'মুকুলের মহফিল'-এর সদস্য আনিস দশ বছর বয়সে কলকাতা ত্যাগ করে খুলনায় আসেন। আর তারপর আনিসুজ্জামান মানে প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে ক্ষান্তিহীন সংগ্রাম। প্রথম জীবনে ছোটোগল্প লিখতেন তবে তারপর জনজীবনের জঙ্গমই যেন তাঁকে টেনে নিয়ে আসে প্রবন্ধ-গবেষণার বিস্তৃত দরবারে। ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আনিসুজ্জামান ছিলেন সম্মুখসারির যোদ্ধা।

আমরা স্মরণ করতে পারি ১৯৫২ সালে প্রকাশিত তাঁর পুস্তিকা *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কী ও কেন?* ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ছাত্র হিসেবে ভর্তি হয়ে আমৃত্যু এই বিভাগকে মহিমামণ্ডিত করে গেছেন তিনি— অতুলনীয় মেধাবী ছাত্র হিসেবে, Thoughts of the Bengali Muslims as reflected in Bengali Literature during the British period (1757–1918) শীর্ষক অসামান্য পিএইচ ডি গবেষণার প্রণেতা হিসেবে, গুণী শিক্ষক হিসেবে এবং এক পর্যায়ে এই বিভাগেরই 'ইমিরেটাস অধ্যাপক' হিসেবে। ১৯৬১ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র যখন রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় তখন চব্বিশ বছরের আনিসুজ্জামান যে বিদ্রোহী ভূমিকা নেন তা যেন ছিল পূর্ববাংলার মানুষের রবীন্দ্রপ্রাণতার প্রতীক। ১৯৬৪ সালে প্রকাশ পাওয়া তাঁর *মুসলিম-মানস ও বাংলা*

সাহিত্য গ্রন্থটি বঙ্গীয় গবেষণা জগতে আজ অব্দি এক অপরিহার্য সহায়সূত্র। সে বছরই শিকাগোতে গেছেন পোস্ট ডক্টরাল ফেলো হিসেবে; তবে বোধকরি শিকাগোর থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল ১৯৬৫ সালে তাঁর মাসাধিককাল লন্ডন অবস্থান। ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি ও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে অধ্যয়ন আর গবেষণা। সেই সময় থেকেই মনের মাঝে উপ্ত হওয়া ধারণা পরবর্তী বছর পনেরোর ধারাবাহিকতায় কাঠামোগত রূপ পায় ১৯৮১ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত Factory Correspondence and other Bengali Documents in the India Office Library and Records, ১৯৮২ সালে *আঠারো শতকের বাংলা চিঠি* এবং ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত *পুরোনো বাংলা গদ্য*-এর মতো সমীহ-উদ্রেকী গবেষণাগ্রন্থগুলোতে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে আনিসুজ্জামান ছিলেন সক্রিয় ভূমিকায়। একাত্তরে কলকাতায় বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সাধারণ সম্পাদক। সে বছর জুনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ তিনি তাঁর আত্মকথায় দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি যেমন ছিলেন মুজিবনগর সরকারের পরিকল্পনা সেলের সদস্য তেমনি স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের বাংলা ভাষ্য প্রণয়নের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তাঁরই উপর; কারণ বাহান্নর ভাষাসংগ্রামী এবং বাংলা ভাষা-সাহিত্যের নিষ্ঠ গবেষক-রূপে তাঁর প্রতি পুরোপুরি আস্থা ছিল বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ-সহ বাংলাদেশের স্বাধীনতার নায়কদের। আনিসুজ্জামান অনেককাল ছিলেন রাজধানী ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু তাঁর অবস্থানই তাঁর অবস্থান-স্থলকে প্রান্তীয় সীমাবদ্ধতা-মুক্ত কেন্দ্র করে তুলেছে। গবেষণার দুর্নিবার আহ্বানে দিল্লি, করাচি, সানফ্রান্সিসকো, ব্লুমিংটন, মনট্রিল, লন্ডন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজ, অক্সফোর্ড, সাসেক্স, টোকিও, কিয়োটো ঘুরেছেন যেমন জীবনের প্রথম চল্লিশে তেমনি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারে তারুণ্যেই ছুটে গেছেন মস্কো কিংবা বুদাপেস্টে।

এক ব্যক্তিগত আলাপনে তিনি বলেছিলেন এই লেখককে যে, তাঁর জীবনে সাংগঠনিক সক্রিয়তায় এত সময় গেছে যে নিজের প্রার্থিত লেখাগুলো হয়ে ওঠেনি ঠিকঠাক। তবে আমরা বিস্ময় মানি, এতসবের মাঝেও কী করে লেখা হয়েছে *স্বরূপের সন্ধানে, মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, মুনীর চৌধুরী, বাঙালি নারী : সাহিত্যে ও সমাজে, ইহজাগতিকতা ও অন্যান্য*-এর মতো দিগদর্শী পুস্তকরাজি! দক্ষ হাতে একক ও যৌথভাবে সম্পাদনা করেছেন *রবীন্দ্রনাথ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, নজরুল রচনাবলি, শহীদুল্লাহ্ রচনাবলি* কিংবা *ত্রৈলোক্যনাথ রচনা-সংগ্রহ*। আনিসুজ্জামান বহুমাত্রিক লেখক। যেমন অনুবাদ করেছেন ওস্কার ওয়াইল্ডের নাটক তেমনি *আইন শব্দকোষ, বাংলা-ফরাসি শব্দকোষ* প্রণয়নেও পালন করেছেন পুরোধা-ভূমিকা। তাঁর আত্মজীবনী *কাল নিরবধি* আর *বিপুলা*

পৃথিবী কেবল তাঁর আত্মকথা নয়, এই জনপদের ক্রমিক অগ্রগমনের বিশ্বস্ত ও নিরাসক্ত ভাষ্যও বটে। আনিসুজ্জামানের প্রধান এক কৃতিত্ব বুদ্ধিজীবীর কেতাবি গণ্ডি ভেঙে রাজপথে-জনপদে, মাটি ও মানুষের শানিত মিছিলে শামিল হওয়ায়। আমরা তাঁকে দেখি অত্যুচ্চ দীপ্রতায়, ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রধর্মের বিধান সংযোজনের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে মামলা রুজু করতে কিংবা ১৯৯২ সালে শহিদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গঠিত গণ-আদালতে বাদিরূপে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ উত্থাপনকারী হিসেবে।

পথটা মসৃণ ছিল না মোটেও, তাই ১৯৯২ সালে তাঁর এবং তাঁর সহযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে তৎকালীন রাষ্ট্রশক্তি যেমন গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিল তেমনি এই সেদিন সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী গোষ্ঠী তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থানের কারণে প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত দেয়, তবু আনিসুজ্জামান মানে এগিয়ে যাওয়া। তাই অসুস্থ শরীরে, জরাকে উপেক্ষা করে সভা-সমাবেশে স্বচ্ছন্দ ছিলেন সবসময়। তিনি ছিলেন ইতিবাচক অতীত ও বর্তমানের ভবিষ্যৎ-মুখী সেতুবন্ধ। তাঁর উদার দুয়ারে ছিল সবার প্রবেশ অবাধ। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তিনি যেমন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক তেমনি ছাত্র-শুভার্থী-স্বজন— সবারই তিনি নির্বিশেষ শিক্ষক 'আনিস স্যার'। এই ভূষণ আরোপিত নয়, এটা তাঁর অর্জন। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান 'স্বাধীনতা পুরস্কার' আর 'জাতীয় অধ্যাপক'-রূপে বরণ করেছে, ভারত সরকার ভূষিত করেছে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে। তবে সবার উপরে তাঁর পরম পাওয়া ছিল বাংলাদেশ-ভারতসহ বিবেকী বিশ্বমানবের ভালোবাসা। এক বসন্তে জন্ম ছিল তাঁর; চলে গেলেন তিনি তবু এমন নামেই তো জন্মে বসন্ত বার বার, অক্ষয় যে বাঙালির নাম আনিসুজ্জামান।

আনিসুজ্জামান : আত্মজীবনীর আলোকে

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান চলে গেলেন কিন্তু তাঁর আত্মকথার দুটো পর্ব *কাল নিরবধি* ও *বিপুলা পৃথিবী*-র মধ্য দিয়ে রেখে গেলেন শতাব্দীপ্রায় সময়ের সবল সাক্ষ্য। আনিসুজ্জামানের আত্মকথার প্রথম পর্ব *কাল নিরবধি* পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ২০০৩ সালে। তারও আগে ১৯৯৭ সালে তাঁর মুক্তিযুদ্ধ-স্মৃতিকথন *আমার একাত্তর* প্রকাশ পায়। বিচিত্র-বর্ণাঢ্য জীবনকথার দুটো পর্বই পাঠক চিত্তজয়ী। তাই *কাল নিরবধি* প্রকাশের এক দশকেরও বেশি সময় পরে প্রকাশিত *বিপুলা পৃথিবী*-র (২০১৫) গ্রন্থরূপ আমাদের সাহিত্যপরিসরে একটি আগ্রহোদ্দীপক বিষয় বৈকি। শেষাংশ ব্যতীত আলোচ্য গ্রন্থের সিংহাংশ ২৩ এপ্রিল ২০০৪ থেকে ৭ নভেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত একটি দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়। ১৯৭২—২০০০; অনধিক ত্রিশ বছরের অনুপম আত্মলেখ *বিপুলা পৃথিবী*। গ্রন্থপ্রারম্ভে

লেখকের 'নিবেদন' অংশ থেকে এই রচনা ধারাবাহিকভাবে পত্রিকায় প্রকাশমুহূর্তের এমন 'পূর্বভাষ' উদ্ধার করা যায়—

> কেউ কেউ অবশ্য সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে যে, যত কাছাকাছি সময়ের কথা বলতে যাবো, তা নিয়ে তর্ক তত প্রবল হবে। এই সাবধানবাণীর সত্যতা আমিও মানি। বিতর্ক এড়াবার একমাত্র উপায় কিছু না-লেখা। না-লিখতে মনটা সায় দিলো না। নিজের সম্পর্কে জানানোটা জরুরি নয়, কিন্তু যা দেখেছি যা শুনেছি, তার অনেকখানি গুরুত্বপূর্ণ।

পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার অনন্য এই আত্মকথাটির পাঠ-পাঠান্তরে উপলব্ধি হয় আনিসুজ্জামানের দেখা এবং শোনার স্মৃতিভাষ্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। নতুন যুগের ভোরে, অস্তাচলের পানে, হননের কাল, কাছে-দূরে, হালখাতা— এই পাঁচ শিরোনামে *বিপুলা পৃথিবী* সাবয়ব।

২৬ এপ্রিল ১৯৭১; মুক্তিযুদ্ধোজ্জ্বল জীবনপর্ব দিয়ে বইয়ের সূত্রপাত আর শেষ হয়েছে নতুন সহস্রাব্দে নোঙর করা এমন অশেষ-অফুরান জীবনাভিজ্ঞানে—

> কথা ফুরোয় না, সময় ফুরিয়ে যায়। লেখায় ছেদ টানা যায়, জীবন কিন্তু প্রবহমান। জীবন ক্রমাগত সামনের দিকেই চলে। আমাদের পথচলা এক সময় থেমে যায়, জীবন থামে না।

যে জীবন এই মহাকায় গ্রন্থ ধারণ করে আছে তা মোটেও ব্যক্তি এককের নয়, বহুর। ব্যক্তির জীবন-সমান্তরালে সময়-সমাজ-রাষ্ট্র ও বিশ্বপরিপার্শ্বের সমষ্টিগত জীবনকথনও *বিপুলা পৃথিবী*। আমরা দেখি আটাশ বছর ব্যাপ্তিবলয়ে এই গ্রন্থ এমন সব গুরুত্ববহ অধ্যায় ছুঁয়ে গেছে যা মোটা দাগে বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে যেমন উল্লেখের দাবি রাখে তেমনি কোনো-না-কোনোভাবে ব্যক্তি আনিসুজ্জামানও সেসব অধ্যায়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। যেমন : স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন, প্রথম শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ, ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমিতে প্রথম জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন, বঙ্গবন্ধু সরকার থেকে তাজউদ্দীন আহমদের দূরত্ব, ১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড, ৩ নভেম্বরে জেল হত্যাকাণ্ড, ৭ নভেম্বরের ঘটনাপ্রবাহ, জিয়া ও এরশাদের ক্ষমতাপর্ব এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, ১৯৮১ সালে বাংলা একাডেমি কর্তৃক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার উদ্যোগ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র সংকলন ও সম্পাদনা, ১৯৮৭ সালের ৩১ মার্চ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে ৩১ নাগরিকের বিবৃতি, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল আন্দোলন ও গণ-আদালত গঠন এবং এই আদালত সংশ্লিষ্ট বিশিষ্টজনদের বিরুদ্ধে সরকারের মামলা, পার্বত্য শান্তিচুক্তি, নজরুল জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন ও নজরুল রচনাবলি, বেতার-টেলিভিশনের সায়ত্তশাসন উদ্যোগ, ২০০০ সালে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে জাহানারা ইমামের নামে ছাত্রীহলের নামকরণ বিষয়ে হুমায়ূন আহমেদের অনশন আন্দোলন ইত্যাদি। দেশের একজন বিশিষ্ট নাগরিক হিসেবে সদ্যস্বাধীন নবীন রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন

আনিসুজ্জামান তেমনি 'বিশিষ্টতা' ভেদী এক সচেতন নাগরিকের দৃষ্টি-আভায় নতুন তাৎপর্যে উন্মোচিত হয়েছে উপর্যুক্ত ঘটনাপরম্পরা। এভাবে নিজেকে গৌণে রেখে আত্মযুক্ত সামাজিক-রাজনৈতিক পর্বের অন্তরঙ্গ ব্যাখ্যানের একটি উদাহরণ হয়ে রইল আনিসুজ্জামানের *বিপুলা পৃথিবী*। সেই সঙ্গে লেখকের গবেষণাকর্ম-সাহিত্যচর্চার বিবরণ এখানে শুধু ব্যক্তিগত কৃতির পরিধিভুক্ত থাকেনি বরং যথাযথ ব্যাখ্যায় বাংলা সাহিত্যের বৃহৎ প্রেক্ষিতও এর সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। লেখকের *পুরোনো বাংলা গদ্য, আঠারো শতকের বাংলা চিঠি, স্বরূপের সন্ধানে, মুনীর চৌধুরী* ইত্যাদি বই প্রকাশ প্রসঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে উদ্ভাবনমূলক তথ্য ও বিশ্লেষণ আমরা পাই তা ব্যক্তিক সৃজনকর্মকে সমষ্টিক তাৎপর্যে করে তোলে সুভাস্বর। বাংলা গদ্য সম্পর্কিত স্বীয় গবেষণাকর্মে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে কাজ করার চিত্রটি এমনই রোমাঞ্চকর যে এখান থেকেই বাংলা গদ্যের উৎপত্তি সম্পর্কে নতুন ধারণা তৈরি হয়—

> ... ঢাকা কুঠির বেশির ভাগ কাগজপত্র ছিল সেখানকার কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট জজ টেলরের আমলের। যে-কোনো কারণেই হোক, তিনি এসব নিয়ে দেশে ফিরে আসছিলেন। পথে জাহাজে তাঁর মৃত্যু হলে এসব কাগজ ইন্ডিয়া অফিসে চলে আসে। ২৪ পরগনার রাজস্বসংক্রান্ত কাগজপত্র কলকাতার বোর্ড অফ রেভিনিউ থেকে হেইলিবারি কলেজে পাঠানো হয়েছিল— সম্ভবত সেখানকার ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য। জঙ্গীপুর কুঠির কাগজও বোধহয় কোনো বিশেষ কারণে লন্ডনে পাঠানো হয়েছিল। বোগল ও হজসন নিজেদের সংগ্রহ দিয়ে গিয়েছিলেন ইন্ডিয়া অফিসে— এগুলো ইউরোপীয় পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইউরোপীয় পাণ্ডুলিপির সহকারী কিপার আর জে বিঙ্গল এগুলোর প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এবারে দেখতে পেলাম কিছু কাগজপত্রের সঙ্গে ইংরেজিভাষায় পেনসিলে লেখা কিছু টোকা রয়েছে। খোঁজ করতে গিয়ে জানা গেল যে, বেঙ্গলি লিটারেচর (অক্সফোর্ড, ১৯৪৮) গ্রন্থের লেখক এবং টমাস অটওয়ের ওয়র্কসের (অক্সফোর্ড, ১৯৩২) সম্পাদক ড. জে সি (জ্যোতিষচন্দ্র) ঘোষকে কোনো এক সময়ে এইসব কাগজ তালিকাভুক্ত করতে দেওয়া হয়েছিল। ড. ঘোষ অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি— তবে পুরোনো বাংলা লেখা বোধহয় খুব ভালো পড়তে পারতেন না। কিছুদিন কাজ করে তিনি আর অগ্রসর হননি।

উপরিতল থেকে অবলোকন নয়, পরিস্থিতির ভেতরে থেকে নিরাসক্ত নৈর্ব্যক্তিকতায় পরিস্থিতির বর্ণনা প্রদান এই আত্মকথার এক অনন্য বিশিষ্টতা। জাতীয় সংবিধানের বাংলা ভাষ্য প্রণয়নে উদ্ভূত বিতর্ক বা শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে মতবহুত্বের কথা এক্ষেত্রে উল্লেখনীয়। সংবিধান প্রণয়নের কথা বলতে গিয়ে এর মর্মগত বিষয়ে যেমন লেখক আলো ফেলেন তেমনি তাঁর দৃষ্টি প্রাসঙ্গিক অন্য অনেক দিকেও প্রসারিত। ফলে সংবিধানের কপি যে প্রান্তিক চর্মশিল্পী চামড়ার বাঁধাইয়ে আচ্ছাদিত করেছিলেন সেই শাহ্ সৈয়দ আবু শফির কথাও বলতে ভোলেননি তিনি। স্বাধীন স্বদেশে একটি প্রগতিশীল শিক্ষানীতি চালু করার

ক্ষেত্রে কোনো কোনো 'প্রগতিশীল' ব্যক্তিত্বের প্রতিক্রিয়াপন্থী ভূমিকার উল্লেখের মধ্য দিয়ে আনিসুজ্জামান প্রমাণ করেছেন তাঁর দায় সত্যের প্রতি। আশা ও ভগ্ন আশার যুগল সম্মিলনে নিজের সঙ্গে সঙ্গে নবীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সম্মুখযাত্রার ইতিহাসের কোনো অধ্যায়ই অপ্রীতিপ্রদ বলে বাদ দিয়ে যাননি লেখক। ফলে সংবিধানের নানান প্রত্যয়ের কথা বলতে গিয়ে পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে অনুধাবনের ব্যর্থতার কথাও বলেছেন খোলামেলা— পাহাড়িদের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য যে সেদিন আমরা উপলব্ধি করতে সমর্থ হইনি, এ ছিল নিজেদের বড়োরকম এক ব্যর্থতা।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ থেকে প্রেরণা পেয়েও যে পাহাড়ি জাতীয়তাবোধের বা চাকমা জাতীয়তাবোধের সূচনা হতে পারে— এ-কথা একবারও আমাদের মনে হয়নি। পরবর্তী এক অধ্যায়ে কবি নজরুলের মৃত্যু ও ঢাকায় সমাধি সংক্রান্ত বিষয়েও আমরা লেখকের সপ্রশ্ন আত্মবিচারের উদাহরণ লক্ষ করি। এই আত্মকথার আরেক বিশেষত্ব গুরুভার বিষয়ের পরিবেশনায় বুদ্ধিদীপ্ত রসের ভিয়েন। জীবনপথের অবসন্নতাকেও যেন তিনি উপভোগ্য করে তুলেছেন অনায়াস প্রসন্নতায়। ১৯৭৪ সালে জাতীয় সাহিত্য সম্মেলনের অনুষঙ্গে তিনি বলেন— বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে আমাদের এক সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি বিদেশে গিয়ে সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগীরা কীভাবে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে। তখন শ্রোতাদের একজন উঠে বললেন, আপনাদের দেশ যে একেবারে বুদ্ধিজীবীশূন্য হয়ে গেছে, আপনার কথা শুনে সে-সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ প্রত্যয় জন্মেছে। আমি বলেছিলাম, সেই শূন্যতার সুযোগে সভাপতির আসনটি আমার দখলে এসেছে। মনোজ বসু আমার কথা খুব উপভোগ করেছিলেন। কিংবা ভারতীয় অতিথি বাণী রায় খাবার টেবিলে লেখকের স্ত্রীকে খাবারের 'ডাল'-এর কথা জিজ্ঞেস করলে জানালা দিয়ে টেবিলে ঝুঁকে পড়া মাধবীলতা গাছের 'ডাল'-এর কথা চলে আসলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তার অসাধারণ সরস বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে— খেতে খেতে বাণী রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কিসের ডাল?' বেবী চটপট উত্তর দিল, 'মাধবীলতার ডাল।'

আমাদের খাবারের টেবিলের পাশে জানলা, সে-জানলার ওপারে মাধবীলতার গাছ। তার একটা ডাল বেঁকে ওই জানলা ঘেঁষে আছে। বাণী রায় জানতে চেয়েছিলেন, যে-ডাল তাঁকে খেতে দেওয়া হয়েছে, সেটা কী। আর বেবী ধরে নিয়েছিল, জানালার ধারে উঁকি দিচ্ছে যে-ডাল, তিনি তার পরিচয় জানতে চাইলেন। বেবীর জবাব শুনে বাণী রায় অস্ফুট স্বরে বলতে লাগলেন, 'জীবনে কত ডাল খেলুম, কখনো মাধবীলতার ডাল তো শুনিনি।' এছাড়া বহু পরের এক অধ্যায়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের ক্ষেত্রে ১৯ ও ২০ অগাস্ট সংক্রান্ত দুর্ঘটের বিশদ বয়ান শেষে লেখক যখন বলেন, 'ব্যাপারটা আগে জানলে উনিশের বদলে বিশে যোগ দিতাম। উনিশ-বিশে পার্থক্য যে

সামান্য নয়, সে জ্ঞান হলো' তখন তা কৌতুকের পর্যায় ছাপিয়ে আরও সূক্ষ্ম সংকেত রেখে যায়। ইতিহাসের অনেক নায়কই কখনো লেখকের ব্যক্তিগত সম্পর্কসূত্রে আবার কখনো-বা ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতের প্রসঙ্গে সমুপস্থিত এ বইয়ে। ব্যক্তিত্বের বিভায় একসঙ্গে বহু বিরোধী মত ও পথের মানুষকে চরিত্র হিসেবে পাওয়া যায় এ বইয়ের ভেতরমহলে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কোনো আলংকারিক বিশেষণে নয়; দেশ ও মানবব্রতী ব্যক্তি হিসেবে আবিষ্কার করি লেখকের সঙ্গে এক সাক্ষাতের বিবরণে যেখানে বিশ্রামের জন্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা না করার অনুরোধের প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু বলছেন :

> লোককে খেতে দিতে পারি না, পরতে দিতে পারি না, দেখাও যদি না দিতে পারি, তাহলে আমার আর থাকল কী?

জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক তাঁর সারল্য ও পাণ্ডিত্য উভয় নিয়ে জীবন্ত বিপুলা পৃথিবীর কেন্দ্রে-প্রান্তে। এমনই তাঁর নির্বিশেষ বিদ্যাগ্রাহীতা যে তৎকালীন তরুণ গবেষক আনিসুজ্জামানকে দেশ-বিদেশের সেমিনারে প্রবন্ধ পাঠ প্রসঙ্গে যেমন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ লোকবয়ানে বলেন :

> ... হেইখানে প্রবন্ধ পড়ার কী দরকার আপনার! অন্যের কাজে সময় নষ্ট না কইরা নিজের কাজ করেন না কেন?

তেমনি সেই তরুণেরই গবেষণাগ্রন্থ *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*-র গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাঁর ইংরেজি অনুবাদেও আবদুর রাজ্জাক প্রবৃত্ত হয়েছিলেন বলে জানতে পারি। এমনিভাবে তাজউদ্দীন আহমদের সততা, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নাগরিক বাউলিয়ানা, রাজেশ্বরী দত্তের চারু-অভিমান, ফ্রাঁস ভট্টাচার্যের গবেষক-নিষ্ঠা, আনোয়ার আবদেল-মালেকের জ্ঞানদীপ্ত সৌজন্যের কথামালা *বিপুলা পৃথিবী*-র গঠনকে হৃৎ-কাঠামো দান করেছে। ১৯৯২ সালে একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল আন্দোলনের আনুপূর্ব বিবরণ এই গ্রন্থের বিশেষ গুরুত্বের দিক। একজন সংবেদী লেখক যে শুধু ঘটনাকে প্রত্যক্ষণেই দায়মুক্ত নন বরং পরোক্ষে গিয়ে ঘটনার মাত্রা ও প্রতিমাত্রাও দেখতে পান তার উদাহরণ— একটি কাকতালীয় ঘটনা এই যে, গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বহাল রেখে সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষণার অব্যবহিত পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাহানারা ইমামের মৃত্যু হয়। এই বক্তব্যের কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না; লেখক শুধু তাঁর লেখার নিরুপম রেখায় দক্ষ চিত্রীর মতো এঁকে গেছেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধ্বস্ত বাংলাদেশে শহিদজননীর মৃত্যুদশার ছবি। প্রসঙ্গের ধারাক্রম মেনে *বিপুলা পৃথিবী*-র প্রতিটি অনুচ্ছেদ নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে জাগে কিন্তু এ পরিসরে তার সুযোগ নেই।

এক সাধারণ পাঠকের অধিকারে শুধু বলতে পারি আনিসুজ্জামানের *বিপুলা পৃথিবী* এই দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করল যে, আত্মকথা ব্যক্তিক সুকৃতির স্বর্ণালি বিবরণগাথামাত্র নয়; ব্যক্তিক

উন্মোচনের মধ্য দিয়ে সময়ের অতীতবিন্দুর সঙ্গে বহমান তরঙ্গের মেলবন্ধনপূর্বক সমষ্টিজীবনের সারাৎসারও বটে। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্ব থেকে সহস্রাব্দ প্রবেশপর্বের যে সময়খণ্ড এই গ্রন্থ ধারণ করে আছে, লেখক তার প্রায় প্রতিটি অভিযাত্রার অংশী। কিন্তু ইতিহাসের শুষ্ক সারণি প্রদানের বিপরীতে তিনি সময়সত্যে বসবাসের যুগপৎ তাপ ও হিমকে আত্মকথনের অধ্যায়ে অধ্যায়ে লিপিকৃত করেছেন। পাঠক তার আস্বাদ নেবেন, নিজের নিকষে যাচাই করে গ্রহণ কিংবা বর্জন করবেন। যে মুক্তদৃষ্টি, উদার-আন্তর্জাতিক মনোভঙ্গি, হৃদয়ী উষ্ণতায় ইতিহাসের ঘটনাধারা ও ব্যক্তির ভূমিকাকে অক্ষরবদ্ধ করেছেন তার উদাহরণ সমকালীন বাংলা আত্মকথায় খুব বেশি নেই। *বিপুলা পৃথিবী*-র এক অংশে লেখক বলেছেন, 'এসব লেখার এই এক দায়। সামনের কথা লিখতে শুরু করলে পেছনের কথা আবার ভিড় করে আসে। তখন ফিরে তাকাতে হয়।' আর আমরা বলি লেখককে যেমন রচনার ধারাবাহিকতা রক্ষায় পেছনে ফিরে তাকাবার বিড়ম্বনা সইতে হয়েছিল উলটো আজকের পাঠক, অনাগত আগামীর পাঠককে সামনে পথচলার জন্য সানন্দে ফিরে তাকাতে হবে আনিসুজ্জামানের *বিপুলা পৃথিবী*-র পানে।